



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 620 - 626

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

যশোধরা রায়চৌধুরীর কবিতায় পর্ব ও পর্বান্তর

রোমিও সরকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিশ্বভারতী

Email ID: romioatfacebook@gmail.com

0009-0000-1055-251X

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Feminist tone,
Repression, Girl,
Nineteenth
Century, Product,
The Subconscious,
Suffering, Love,
Technology,
Motherland,
Wond.

Abstract

In the history of Bengali modern poetry, poet Yashodhara Roychowdhury of the nineties is a unique known name. It is not only that he was a feminist poet, but in his written literature various notes of the life of modern people have been caught. The history of various tensions of human life has come up in his writings in various ways and subjects. Poet Yashodhara Roychowdhury is a versatile literary genius, sometimes we find him as a poet and children's writer, sometimes as a storyteller, novelist, essayist and translator. In this essay we will try to find out the multi-dimensional aspects of the poet by exploring the various episodes and episodes of the poet mainly with the help of analyzing his poetry.

Discussion

“কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র - তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি - তাহা তো-আমাদের হাতেই আছে - পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তিনি কি গুণে কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই বলিতে হইবে।”

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে মন্তব্যটি করেছিলেন, সে কথা কবি যশোধরা রায়চৌধুরী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাই কবি যশোধরা রায়চৌধুরী-এর কাব্য ভূবন সম্পর্কে জানবার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যাপিত জীবন সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ ব্যক্তিকে বাদ কখনো সমাজ অথবা সাহিত্য বিচার করা সম্ভব নয়। আমরা কবির ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করব।

সূচনা পর্ব : ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কবির জন্ম হয়। তাঁর বাবা বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী সাহিত্যিক দিলীপ রায়চৌধুরী এবং মা চিত্র ও কণ্ঠ সংগীত শিল্পী অরুন্ধতী

রায়চৌধুরী। শৈশবে তিনি ছবি আঁকতেন, জামাকাপড় ডিজাইন করতেন এবং মায়ের উৎসাহেই বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতেন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে ‘কবিতা পাক্ষিক’ প্রকাশনী থেকে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পণ্যসংহিতা’ প্রকাশিত হয়। এরপর ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রায় উনিশটির ও বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো কবির কলম সৃষ্টিশীল রচনায় নিমগ্ন রয়েছে। তিনি ১৯৮৭ সালে দর্শন বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসে যোগ দেন। কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা কবির সাহিত্যিক জগতকে সমৃদ্ধ করেছে বলে মনে করি।

বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে অর্থনীতিতে মনমোহন সিংয়ের উদারীকরণ নীতির ফলে জনজীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সবকিছুকে পণ্যের দৃষ্টিতে দেখার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এই সময় তাই মনের জিনিস মনজিনিসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে ‘পণ্যসংহিতা’তে এই ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়।

“দেহবোধ থাকলেই তাকে ঘাড় ধরে মাটিতে শুইয়ে দেওয়াও থাকবে
কেউ কেউ নিজের প্রেমিকাকে অক্ষিকোটরের মধ্যে ঢুকিয়ে, তালাবন্ধ করে
তারপর বাহিরে যাবে, সফট পর্নোবিতরণের দোকানে
যেখানে প্রতিটি জঘন্য পত্রিকার সঙ্গে ফ্রি দেওয়া হয়
একটি করে মেয়ে
দেহবোধ ছিল না বলেই মাস্তানি মেরেছিল কবির
তাদের দেহহীন কবিতারা অজন্তার পাহাড়ে আঁকা অহো উৎকীর্ণ
এতদিনেও ওই দশবারো কোটি বাচ্চা মরেনি: কেননা দেহ নেই
আমরা তো মরে যাবো: ডবল স্ট্যান্ডার্ড মরে যাবে

...

নিরুদ্দিগ্ন, ক্রেতাহীন হয়ে যাবে গোটা একটা দেহের বাজার।”^২

কবিতাটিতে মেয়েদের দেহকে বিজ্ঞাপনের আধারে পণ্যদ্রব্যের মতো ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। নারী শরীর যেন যথার্থই অর্থেই একটা গোটা দেহের বাজার হয়ে উঠেছে। এই কাব্যগ্রন্থের ‘বিজ্ঞাপন’, ‘পৃষ্ঠ প্রদর্শন’, ‘বিউটি পার্লার’, ‘উইভো শপিং’, ‘বিশেষ ত্বক সংখ্যা’ প্রভৃতি কবিতায় এই পণ্য প্রবণতার ছাপ আরো সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখ্য পর্ব : এই পর্বে মানব জীবনের শাস্ত্রত প্রেম ও ভালোবাসার কথা এসেছে। কবির যৌবনের দিনগুলিতে রোমান্টিক বিরহের গাঁথা এই পর্বের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তখনও অনলাইনে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মত জগৎ আসেনি, তার ফলে রেডিও ও দূরদর্শনের মধ্য দিয়ে সকলেই রোমান্সের ছোঁয়া অনুভব করত। এই পর্বে ‘পিশাচিনী কাব্য’, ‘চিরন্তন গল্পমালা’ এবং ‘রেডিওবিতান’ কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে কবির নারীবাদী ভাবনার বীজ সূত্র এবং রোমান্টিক স্বর খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েকটি কবিতার উদাহরণের সাহায্যে এই পর্বের বিষয় ও ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. “পরিশ্রম বলেছিল ঘাম আর হৃদয় বলেছে মাথাজোড়া
ভীষণ কষ্টের কথা: কোনওটাই বিশ্বাস করিনি
যতক্ষণ না পিঠ বেঁকে গেল শুধু প্রেমকে সরিয়ে রাখতে গিয়ে
যতক্ষণ না হৃদয় দুমড়িয়ে দিল, কষ্ট: যেই পারলাম না,
প্রেমটিকে অনুমতি দিলাম, ঢোকার।”^৩
২. “শৈশব বাল্যের ছিরি- মায়ামোহে উর্ধ্বঅঙ্গ ভেজা
লুকনো চাহনি, তার কানে কানে দুটো শব্দ বলা
অথবা না-বলা, তবু সে-কোন শব্দে

লাল হয়ে যায় কান? ঘোর শীতে অসহ্য মুকুলে
এমন অস্থির হয় কৃষ্ণচূড়া কিশোরের কৃষ্ণের বাগানে

এত ছোটবেলায় হাসি, ঠাট্টা, এত শিশুমুখের উত্থান
ওই ছেলেটির আমি প্রেমে পড়ে গেছি।”^৪

প্রথম কবিতাটিতে শ্রম আর মনের দ্বন্দ্ব মনকেই এগিয়ে রেখেছেন কবি। জীবনের সমস্ত পর্বেই প্রেম বলে যদি কিছু না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, হৃদয় বলে কোন বস্তুর স্পর্শই যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত কাজই কষ্টের ও পরিশ্রম বলে মনে হয়। তাই কবি জীবনে প্রেমকে প্রবেশের ছাড়পত্র দিলেন। আর দ্বিতীয় কবিতাটিতে কিশোরী বয়সের কোন এক মেয়ের প্রেমে পড়ার মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনার ছবি আঁকেছেন কবি।

নারীবাদী পর্ব : এই পর্বে কবির নারীবাদী সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কবির ‘আবার প্রথম থেকে পড়ো’, ‘মেয়েদের প্রজাতন্ত্র’ এই কাব্যগ্রন্থ গুলিকে এই নারীবাদী পর্বের মধ্যে ভাগ করা যেতে পারে। এই পর্বে নারীর অত্যাচার, সংগ্রাম এবং অবচেতনতার কথা উঠে এসেছে বারে বারে। আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুটো কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

১. “আমাদের যেন আর সময়ের দাম
নেই’-মহেশ্বর মহাবিরজ, ‘ও মেয়ে, তুমি যাও
এখনও গতির আছে, খেটে খুটে খাও
কর্মেই তোমার মোক্ষ, বিধান দিলাম যত
পারো উৎপাদন করহ সন্তান।”^৫
২. “(জনৈক লাজুকলতা নেমে এসে বলল কানে কানে
একটা কথা বলছি, আপনারা কেউ ভুল বুঝবেন না
আজকের এই অনুষ্ঠানটা পুরুষদের জন্য কিন্তু নয়)

এ কেবল নারীদের একদম নারীদের ব্যাপারসম্পার
বিবাহসংগীতপাটি... মেহেন্দির স্কূর্ত ব্যবহার...
এই অনুষ্ঠান করতে প্রথমে মহিলা লাগে কিছু
শ্যামা আঁজাকে লাগে, একটু লাগে পুনম তিওয়ারি
লাজুকলতাকে লাগে পতলী কোমর লাগে আর
হাততালি দিয়ে হেসে ঢলে পড়তে আরও কিছু নারী।”^৬

প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটো কবিতাতেই নারীবাদী স্বর রয়েছে। তবে প্রথম কবিতাটিতে মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ করে তাদের মত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। আর দ্বিতীয় কবিতাটিতে নারীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবন উপভোগ করবার কথা চিত্রিত হয়েছে। প্রথম কবিতাটিতে সমাজে নারীদের অবস্থানের সঙ্গে দ্বিতীয় কবিতার নারীদের অবস্থানের বদল ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন যে কেবল সময়ের হাত ধরে হয়েছে তা নয়, নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার কারণেও দৃষ্টিভঙ্গির পট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

কবি যশোধরা রায়চৌধুরী-এর কবিতায় বিভিন্ন পেশায় মেয়েদের অবমাননা, অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন- কখনো সাধারণ শ্রমজীবী কাজের মেয়েদের দুঃখের কথা, কখনো স্কুলের মেয়েদের অবদমিত যন্ত্রনার কথা, আবার কখনো প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে হয়রানি-এর বিষয়গুলো কবিতায় অবলীলায় উঠে এসেছে। কবি নিজে একজন নারী বলেই হয়তো অতি সহজেই মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার এমন সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন। এছাড়াও

নারীবাদী সুর কবির কাব্য গ্রন্থগুলির নামকরণগুলির দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা সহজেই বুঝতে পারব। যেমন- ‘মাতৃভূমি বাম্পার’, ‘মেয়েদের প্রজাতন্ত্র’ ইত্যাদি। তাছাড়া নারীবাদী ভাবনার বিষয় কবির অজস্র কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা ‘শ্বেতাজিনী’ কবিতাটি থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

“সচরাচর আমরা এইভাবে ধর্ষিতা হই না।

সচরাচর আমাদের ধর্ষণ হয় অনেক বীভৎস।

আমাদের ধর্ষণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। ধানখেতে, জলে

শুয়ে থাকতে থাকতে আমরা টের পাই,

বাস্তাসাপ চলে যাচ্ছে

নাসাপথে, চোখে ছিদ্র করে।

সচরাচর আমাদের বাঘের বাচ্চারা

একসাথে অনেকে মিলে এক ঘাটে জল টল খেয়ে

হরিণ শিকার করে। ছিঁড়েখুঁড়ে খায়। তারা পরে বলে

অপর্ণা মাংসে হরিণা বৈরী।”^৭

সচরাচর ধর্ষণ স্বাভাবিকভাবে হয় না। ধর্ষকেরা ধর্ষিতার উপর নারকীয়, বীভৎসভাবে নিপীড়ন চালায়। কখনো কখনো অত্যাচারের মাত্রা এতটাই তীব্র ও বীভৎস হয় যে, ধর্ষিতার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। একটি বাঘ যেমন করে হরিণকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়, ঠিক তেমনি ধর্ষকেরা ধর্ষিতার উপর চরম নিপীড়ন চালায়। আর নিজেদের দোষ ঢাকতে হয়তো চর্যাপদে ভুসুকু পাদের রচিত পদে ব্যবহৃত প্রবাদের মতো বলেই ফেলে ‘অপর্ণা মাংসে হরিণা বৈরী’। অর্থাৎ নিজের মাংসই হরিণের শত্রু। এই কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী লেখক ও দার্শনিক ‘সিমোন দ্য বোভোয়ারের’ কাছ থেকে কথা ধার করে নিয়ে বলা যায় যে, মেয়েরা আসলে জন্মায় না, সমাজ তাদের নারী করে করে তোলে।

এক সময়ে পুরুষ লেখকদের কলমে মেয়েদের মনোজগতের বিষয় পুরুষদের মতো করে সাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। মেয়েরাও পুরুষদের দৃষ্টিতে নিজেদের দেখছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পর্যন্তও সেভাবে আমরা মহিলা লেখক পাইনি। বিশেষত কাব্য কবিতা তো নয়ই। মেয়েদের লেখালেখির বিষয়ে প্রাবন্ধিক সুতপা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, মেয়েরা আদৌ কবিতা লিখতে পারে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁর ‘কবিতায় নারী, নারীর কবিতা’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন -

“সত্যিই তো মেয়েরা কল্পনা করতে পারেই না। কবিতা লিখতে চায় যদি কোনো মেয়ে, তবে হয়তো তার বালিকা বয়সেই সে অনুভব করে নিজের কল্পনাশক্তির সীমা...। কিন্তু এমনটাই তো হবার কথা। কল্পনা যে করে সেই বিষয়ীকে নিজের মধ্যে চিনে নেওয়া মেয়েদের পক্ষে কি সহজ? যে ভাষা দিয়ে সে কল্পনা করবে, যে ছবি দিয়ে সে কল্পনা করবে, সেই ভাষা সেই ছবি পুরুষ-পেশিত সমাজের, তার সাহিত্যের। সে ভাষা সে ছবি মেয়েদের শেখায় পুরুষ নির্দেশিত এক ভুল ঐক্য। সাহিত্যের পরম্পরা থেকে মেয়েরা সাধারণত সেই ভুল ঐক্য গ্রহণ করে এবং প্রতিফলিত করে। নিজেকে বিষয়ী হিসেবে জানতে গেলে কোনো মেয়েকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেই পরম্পরার বিপরীত মুখে।”^৮

‘কবির লিঙ্গ নেই’ এ কথার বিষয়বস্তু যাই থাকুক না কেন, তবে কোথাও না কোথাও কবির রাজনৈতিক, অর্থ-সামাজিক অবস্থান কবিতার মধ্যে থেকে যেতে বাধ্য। বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে নারীবাদী চেতনায় অপরাজিতা দেবী, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, গীতা চট্টোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র প্রমুখ কবিদের পাশাপাশি যশোধরা রায়চৌধুরী-এর নামও একই আসনে উচ্চারিত হয়।

প্রযুক্তিগত পর্ব : একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই মানুষের জীবনে প্রযুক্তিগত দিক থেকে ইন্টারনেট চলে এসেছে এবং পৃথিবী নাকি ক্রমশ ছোট হতে হতে সবাই প্রযুক্তির অন্তর্জালের ফাঁদে পড়ে গেছে। এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়া

সহজ কথা নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কথা ধার করে আমরা বলতে পারি - বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি। কবি ও সাহিত্যিকরা ভিন্ন গ্রহের প্রাণী নয়, তারাও আমাদের মত সামাজিক মানুষ। সুতরাং তাদের রচিত সাহিত্যের ভাব ও বিষয়ে প্রযুক্তিগত ভাবনা অটোমেটিক ভাবেই চলে এসেছে। কবি যশোধরা রায়চৌধুরীও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কবি নন। তাঁর ‘কুরুক্ষেত্র অনলাইন’ এবং ‘ভার্চুয়াল নবীন কিশোর’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে এই প্রযুক্তিগত নির্ভরতার প্রকাশ দেখা যায়। বর্তমান সময়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি সামাজিক মাধ্যমগুলি মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, কবি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই বলেছেন -

“তুই জানিস এই জাল মিথ্যের দুনিয়া
ইন্টারনেটের জালে ফেঁসে আছি আমি
তোকে আমি ধরব, তবু ধরতে পারছি না
ভালোবাসাভরা গ্রুপে স্পর্শ নেই, রামী!

চণ্ডীদাস হয়ে যাব, জীবনানন্দও?
আর কি কি দাশ হব, ms-dos হব?
চতুর খুলেছি আই ডি, সত্য আঁকাবাঁকা
তুই যে ছবিটা আঁকলি, সত্যি তোর আঁকা?

না হলেও ক্ষতি নেই; বিশ্বাস করব না
আগুন যেমনই হোক, পোড়াব না পাখা
আমি জানি এ দুনিয়া মিথ্যে, ঢপ, জাল,
তবু তোকে অবিশ্বাস করতে পারব না...”^৯

‘নবীন কিশোর তোমাকে দিলাম ভুবন গ্রামের মেঘলা আকাশ’ কবিতাটি ‘ভার্চুয়ালের নবীন কিশোর’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটি ২০১০ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ২০০৪ সালে ফেসবুক এবং ২০১০ সালে হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রাম চলে এসেছে। সেই সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়েও এইসব সামাজিক মাধ্যমগুলোর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। বাস্তব জীবন থেকে আমরা যেন ক্রমশই সড়তে সড়তে দূরে চলে যাচ্ছি এবং ইন্টারনেটের অলীক জগতের মোহময়ী ফাঁদে ফেঁসে যাচ্ছি। কবিতাটির মধ্যে ইন্টারনেটের মিথ্যা মায়াজালে ও ঢপের কথার দ্বারা আশার ছলনে ভুলে বিপদগ্রস্ত হওয়ার কথা অসাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন কবি। সেই সঙ্গে বাস্তব জগতের সঙ্গে ইন্টারনেটের জগতের যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলছে একথাও তুলে ধরেছেন কবি। ইন্টারনেটের কাল্পনিক জগতের গোলকধাঁধায় আমরা যেন পথ না হারিয়ে ফেলি, সে বিষয়েও কবি আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। কবির সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও তাই কল্পনার জগতের সঙ্গে ও বাস্তবের জগতের তুলনা করে একথা বলতেই পারি যে - যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা,/ আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা। অর্থাৎ ইন্টারনেটের কল্পনার জগত দূর আকাশের বিশাল ও বর্ণিল রংধনুর মত যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, পৃথিবীর বুকে থাকা রক্ত মাংসের জীবন্ত ক্ষুদ্র ও সাধারণ প্রজাপতির রঙিন পাখা বাস্তব জগতে জীবন সৌন্দর্যের ভরপুর আনন্দ দেয়।

ঐশ্বর্য পর্ব: কবি যশোধরা রায়চৌধুরী জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কবিতা লেখেন নি। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ঘটে যাওয়া নানান অসংগতি, যন্ত্রণা ও ব্যথা উপশমের জন্য তিনি কলম ধরেন। তাঁর কবিতায় একটি নারীবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় ঠিকই, তবে সেইটাই সব নয়। নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পাশাপাশি লিঙ্গ ও ধর্মকে দূরে সরিয়ে রেখে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিক প্রিজমের মতো নানান ডাইমেনশনের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই পর্বে কবি যশোধরা

রায়চৌধুরী- এর নিজস্ব দর্শন ভাবনার পরিণত ও সমৃদ্ধ সম্পন্ন কাব্যগ্রন্থ গুলি প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- ‘ক্ষত’, ‘জ্বর পরবর্তী’, ‘পীড়াসমূহ’ প্রভৃতি। কবির এই পর্বের কাব্য কবিতার বিষয়ের মধ্যে শরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনের আধার হয়ে আছে। শরীরকে আশ্রয় করে মন, মনকে আশ্রয় করে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সমষ্টি চেতনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। শরীরের উপর যে ক্ষত, জ্বর, ব্যাধি, কাম, বার্ধক্যের অত্যাচার অবমাননার চিত্র সেই সকল অনুভবগুলি ব্যক্তি চেতনা থেকে সমষ্টি চেতনায় পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে করি।

“বার বার আমি ফিরে আসবো তার কাছে
বার বার তাকে কামড়ে খাবো
শুষে নেব তার থেকে যাবতীয় শাঁস
আশ্চর্য নরম সেই শক্ত জীবনখানি, কখনও ফেলবে না মুখ থেকে
...
বার বার আমি ফিরে আসবো তার কাছে
বার বার তাকে কামড়ে খাবো
শুষে নেব তার থেকে যাবতীয় শাঁস...”^{১০}

কবিতাটি ‘ক্ষত’ কাব্যগ্রন্থের ‘কামড়’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটিতে দেহ বা শরীরের প্রসঙ্গ আছে ঠিকই, তবে তিনি দেহাত্মবাদী কবি নন। দেহকে আশ্রয় করে দেহাতীত ব্যঞ্জনা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। কবিতাটির মধ্যে দেখা যায় যে, কথক বার বার এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে ফিরে আসছে এবং তাকে কামড়ে, শুষে, ছিঁবড়ে করে তার জীবনের শাঁস কেড়ে নিতে চাইছে। অথচ তার যেন কিছুই করার নেই। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট মানুষটিকে অত্যাচারিত নিপীড়িত যা খুশি তাই করা যায় তবুও তার কিছুই করার থাকে না। এই কবিতাটিকে কেবল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, মালিকের সঙ্গে শ্রমজীবী অধস্তন কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পড়া যায়।

অনুবাদ পর্ব : অনুবাদের মধ্য দিয়ে কবি যশোধরা রায়চৌধুরীকে অনেকখানি পাওয়া যায়। বিশেষত ফরাসি ভাষায় সার্জ ব্রেমলির ‘লিওনার্দো দা ভিন্সি’ এবং লুক মোঁতিইনিয়-এর ‘অসুখ : প্রতিরোধের জানালা’ ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ করার ফলে কবির কাব্য রচনার সমৃদ্ধি ও পরিধি উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে করি।

নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময়েও যেহেতু কবি নানান সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন সেহেতু ভবিষ্যতে কবি কোন দিকে দিক পরিবর্তন করবেন সে বিষয়ে আমরা এখনো কিছু বলতে পারি না। তবে কবির লেখনী এইভাবেই সচল থাকুক এবং নানা সৃষ্টিশীল রচনা এইভাবেই আমাদের উপহার দিয়ে চলুক এই শুভকামনা করি। একজন উচ্চপদস্থ অমলা হিসেবে কবি নিজেকে যেমন অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ঠিক তেমনি বাংলা আধুনিক কবিতার জগতেও শুধুমাত্র নারী কণ্ঠস্বর নয়, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কবি হয়ে নিজ আসনখানি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Reference:

১. দত্ত, ভবতোষ (সম্পাদ), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, জিজ্ঞাসা, ১৩৩ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৯৬৭, পৃ. ১৪
২. রায়চৌধুরী, যশোধরা, কবিতাসংগ্রহ, প্রথম খন্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১
৩. রায়চৌধুরী, যশোধরা, কবিতাসংগ্রহ, প্রথম খন্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০
৪. তদেব, পৃ. ৬৮

-
৫. রায়চৌধুরী, যশোধরা, কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৪
 ৬. রায়চৌধুরী, যশোধরা, কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৬
 ৭. তদেব, পৃ. ৩০
 ৮. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মেয়েলি পাঠ', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৪
 ৯. রায়চৌধুরী, যশোধরা, কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১২৫
 ১০. রায়চৌধুরী, যশোধরা, কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৪১